Written by ফরিদে মাহব্ুব কামাল
Sunday, 25 December 2011 21:02 - Last Updated Thursday, 29 December 2011 19:07

□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□

একটি জাতরি পরাজয় এবং বপির্যয়রে কারণ নানাবধি। তবে শ্রুটি হিয় জনগণরে চতেনায়। হাত-পায়ে যত শক্তই থাক, মগজ হ্ুশ হারালে দহেও শক্তহীন হয়ে পড়ে। তমেনি অবস্থা একটি জাতরি। অতীতে ম্ুসলমানগণ যখন বজিয়রে পর বজিয় আনছলি এবং বশি্বশক্তরি ূপে দ্রুত প্রতষি্ঠা লাভ করছলি তখন তাদরে তলে-গ্যাস ছলি না, বশিাল জনশক্তওি ছলি না। হাজার হাজার মসজদি-মাদ্রাসাও ছলি না। শত শত কলজে বশি্ববদি্যালও ছলি না। কনি্তু উম্মাহর জীবনে তখন প্ুর্ণ হ্ুশ ছলি, নজিদেরে বাঁচার ম্ূল মশিন নয়িে পরপি্ূর্ণ সচতেনতাও ছলি। সে হ্ুশ এবং সে সচনেতার ম্ূল ভতি্তটি ছিলি ঈমান এবং কোরআনী জ্ঞান। কনি্তু আজ সে হ্ুশ নইে, জীবনরে মশিন নয়িে সে সচতেনতাও নাই। সে বোধ যে শ্ুধ্ু সাধারণ ম্ুসলমানদরে জীবন থকেে তা হারয়িে গছেে তা নয়, আলমে র্ূপে যারা পরচিতি হারয়িে গছেে তাদরে জীবন থকেওে। ফলে ইসলামরে পরপি্ূর্ণ অন্ুসারি র্ূপে বড়ে উঠার বদলে নানা ভাষা, নানা দশে, নানা মজহাব ও নানা ফরেকার পরচিয় নয়িে বড়ে উঠাটইি ম্ুসলমানদরে জীবনরে ম্ূল প্রায়োরটিি পরিণিত হয়ছে। ফলে প্ৃথবীতে আজ ৫৫টরি বশেী ম্ুসলমি দশেরে জাতীয় পতাকা উড়ছ, কনি্তু কোথাও উড়ছে না ইসলামরে পতাকা। ক্ুফরি আইন-কান্ূন, স্ূদ-ঘ্ুষ, মদ-জ্ুয়া, পতিতাব্ৃত্তি এসবও ম্ুসলমি দশেরে অলংকারে পরণিত হয়ছে। ম্ুসলমি রাষ্ট্রগ্ুলতিে প্রতষি্ঠা পয়েছেে স্বরৈাচার ও রাজতন্ত্র। পদদলতি হচ্ছে মানবকি অধকিার।

ইসলামরে এ স্ুস্পষ্ট পরাজয়রে পরও ম্ুসলমানদরে মাঝে মাতম নইে। তা নয়িে ভাবনা ও আলোচনাও নাই। নতে্ৃবর্গ ব্যস্ত পরবিার, দল ও জাতরি এজণে্ডা নয়িে। এবং জনগণ ব্যস্ত নজি নজি এজণে্ডার বাস্তবায়ন নয়িে। জনগণরে ধর্মপালন, রাজনীতি, সংস্ক্ৃতি, আইন-কান্ূন নয়িওে যে আল্লাহতায়লার স্ুস্পষ্ট এজণে্ডা আছে এবং সে এজণে্ডার বাস্তবায়নে ম্ুসলমানরে যে ঈমানী দায়বদ্ধতা আছে -সে হ্ুশও তাদরে নইে। বরং বচি্য্ুতি এমন পর্যায়ে পৌছছেে য,ে বসি্ম্ৃতরি পাশাপাশি প্রশ্ন তোলা হচ্ছে মহান আল্লাহর এজণে্ডা ও তার বাস্তবায়নরে ন্যায্যতা নয়িে। বতিণ্ডা উঠছেে খোদ ইসলামি রাষ্ট্রর প্রতষি্ঠা নয়িে। অনকেরেই দাবী, কোরআন নাযলিরে লক্ষ্য ইসলামি রাষ্ট্রর প্রতষি্ঠা নয়, বরং ব্যক্তরি ইসলাহ ও আত্মীক পরশি্ুদ্ধি। অথচ তারা ভ্ূলে যান, পবতি্র কোরআনে বহ্ু আয়াত নাযলি হয়ছেে আল্লাহর আইন বাস্তবায়নরে তাগদি দতি।ে সাহাবী করোমদরে জানমালরে বপি্ুল অংশ ব্যয় হয়ছেে ইসলামি রাষ্ট্রর প্রতষি্ঠায় এবং রাষ্ট্ররে আল্লাহর এজণে্ডা বাস্তবায়ন।ে শতকরা ৬০ ভাগরে বশেী সাহাবী সে কাজে শহীদ হয়ছেনে। নবীজী (সাঃ) য্ুদ্ধরে পর য্ুদ্ধ সংগঠতি করতে হয়ছে,ে নজিকেে সসেব য্ুদ্ধে অংশ নতিে হয়ছেে এবং নজিকেে আহতও হতে হয়ছে।ে ম্ুসলমান হওয়ার অর্থই হলো আল্লাহতে প্ূর্ণ আত্মসমর্পন। আর যে কোন বদি্রোহ ও অবাধ্যতাই হলো ক্ুফর। সটেি যমেন ম্ুসলমানরে ব্যক্তি জীবনে তমেনি সামাজকি ও রাষ্ট্রীয় জীবন।ে ব্যক্তরি জীবনে তো পরশি্ুদ্ধি আসে এর্ূপ জহিাদে ও ত্যাগরে পথ।ে যখোনে সে জহিাদ ও ত্যাগ নাই সখোনে নামায-রোযা, হজ-যাকাত বাড়লওে পরশি্ুদ্ধি বাড়ে না। বরং ম্ুসলমি দশেে তখন বশি্ব চ্যাম্পয়িন নয় দ্ুর্নীততি।ে “সামযে়ে'না ওয়া তায়া'না” অর্থা। আল্লাহর হ্ুক্ুম শ্ুনলাম এবং মনেে নলিাম –আত্মার এমন ধ্বনমি্ূলত পরশি্ুদ্ধ আত্মার। ম্ুসলমি সমাজে সটেি বলি্ুপ্তি হয়ছে।ে বরং “শ্ুনলাম এবং বদি্রোহ করলাম” –সটেইি আজ নীততিে পরণিত হয়ছে।ে সে বদি্রোহরে উপরই প্রতষি্ঠতি আজকরে ম্ুসলমি রাষ্ট্রসম্ূহরে সংবধিান, সংস্ক্ৃত,ি অর্থনীতি ও রাজনীত।ি ফলে ম্ুসলমি দশেে মহা-পরাক্রমশালী আল্লাহর সার্বভৌমত্বরে বদলে প্রতষি্ঠা পয়েছেে মান্ুষরে সার্বভৌমত্ব। নর্দমায় গয়িে পড়ছেে শরয়িতী আইন, খলোফতী শাসন ও বশি্বম্ুসলমি ভাত্ৃত্ব।

[illegible]

ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এখন আর শুধু মুসলিম দেশের সেক্যুলারদের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়, অনাগ্রহ ও বিতণ্ডা শুরু হয়েছে আলেম সমাজ ও ইসলামী দলগুলোর মধ্যেও। দেশের রাজনীতি এবং শরিয়তের প্রতিষ্ঠা নিয়ে তাবলিগ জামায়াত, নানা তরিকার সুফীদল ও অধিকাংশ পীরদের কোন মাথাব্যাথা নেই। তাদের এ অনাগ্রহে প্রচণ্ড খুশি সেক্যুলার চেতনার মুসলমানেরা। অথচ অধিকাংশ মুসলিম দেশের রাজনীতিতে এরাই বিজয়ী শক্তি। পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের স্ট্রাটেজী, এদেরকে সাথে নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিটি উদ্যোগকে প্রতিহত করা। অপরদিকে যেসব আলেম ইসলামি রাষ্ট্র নির্মানে বিশ্বাসী তারা হলেন, নজদের মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব, বাংলার হাজী শরিয়তুল্লাহ ও হাজী নেছার আলী তিতুমীর, মিশরের শহীদ হাসানুল বান্না, শহীদ কুতুব, শেখ ইউসুফ কারযাভী, পাকিস্তানের মাওলানা মওদূদী ও ডাক্তার ইসরার আহমদে, ফিলিস্তিনের শেখ আযযাম, সূদানের ডক্টর হাসান তুরাবী প্রমুখ। শিয়াদের মধ্যে এ মতের প্রধান ধারক হলেন, ইরানের আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনী, আয়াতুল্লাহ মোতাহারী, লেবাননের শেখ ফজলুল্লাহ প্রমুখ। ইরানের বিপ্লব, আফগানিস্তানে তালেবানদের উত্থান ও মধ্যপ্রাচ্যের বিপ্লবের ফলে এ মতের অনুসারিরা দ্রুত জনপ্রিয়তা পেয়েছে। তবে তাদের ঘোরতর প্রতিপক্ষ রূপে দাঁড়িয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ইসরাইল ও ভারতসহ বিশ্বের তাবত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ। নবীজী (সাঃ)র নির্দেশিত ইসলামের মূল ধারায় ফিরে যাওয়ার যে কোন উদ্যোগকে তারা বলছে মৌলবাদ। চিত্রিত করছে পাশ্চাত্যের সেক্যুলার মূল্যবোধের ঘোরতর প্রতিপক্ষ রূপে। মুসলমানদের বর্তমানের বিভক্ত মানচিত্র ও পরাজিত অবস্থাকে বলছে স্থিতিশীলতা। তাদের দাবী, মুসলিম বিশ্বের এ স্থিতিশীলতাকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। "গ্লোবাল ওয়ার অন টেররের" নামে নানা দেশে তারা যে রক্তাত্ব যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে তার মূল লক্ষ্য, ইসলামের এ বিপ্লবী ধারাকে প্রতিহত করা।

ইসলামী রাষ্ট্র নির্মান নিয়ে মুসলিম দেশের সেক্যুলারিষ্টদের চেতনা বিভ্রাট যে কতটা প্রকট তার একটি উদাহরণ দেয়া যাক। আওয়ামী লীগের নেতা এবং এক সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন জনাব হোসেন শহীদ সহরোয়ার্দী। পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার দাবীর জবাবে তিনি বলতেন, ইসলামী রাষ্ট্র আবার কেন? যে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ মুসলমান, সেটিই তো ইসলামী রাষ্ট্র। অবাক করার মত কথা। অথচ জনাব সহরোয়ার্দী নিরক্ষর বা মুর্খ ছিলেন না। ছিলেন ব্যারিষ্টার, জন্ম নিয়েছিলেন এমন এক মুসলিম পরিবারে যে পরিবারে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিসহ বহু জ্ঞানী ব্যক্তি জন্ম নিয়েছেন। কিন্তু এই হলো তাঁর জ্ঞানের গভীরতা! একই রূপ চেতনা বিভ্রাট নিয়ে বসবাস করছে প্রতিটি মুসলিম দেশে বিপুল সংখ্যক মানুষ। অথচ পরিবারের সদস্যরা নামে মুসলিম হলেই সেটি ইসলামি পরিবার হয় না। কত পরিবারেই তো আছে যেখানে নামায-রোযা-হজ-যাকাত নাই, পর্দা-পুশিদাও নাই। হারাম-হালাল, সূদ-ঘুষের বাছবিচারও নাই। এমন পরিবারে মদজুয়া, নাচ-গান, ব্যাভিচারি ও বেপর্দাগী যেমন চলতে পারে, তেমনি সেগুলি সেক্যুলারিজম, সমাজবাদ ও জাতীয়তাবাদের ঘাঁটিও হতে পারে। সেসব পরিবারের লোকেরা এমনকি কোরআনী বিধানের প্রয়োগের বিরুদ্ধে যুদ্ধাংদেহীও হতে পারে। এমন পরিবারের সদস্যরা নামে মুসলমানের হলেও তাদেরকে ইসলামী বলা যায় না। তেমনি ইসলামী হয় না মুসলিম রাষ্ট্রও।

□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□

ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিতর্কটি শুরু হয়েছে মূলত ইসলাম-পালন নিয়ে মতের ভিন্নতা থেকে। সবাই যেমন ইসলামকে একই ভাবে দেখে না, তেমনি ধর্মকর্মও সবাই একই ভাবে করে না। ইসলাম বলতে অনেকেই বুঝে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল, আখেরাত, বিচারদিন, ফেরেশতা ও আসমানী কিতাবের উপর ঈমান এবং নামায-রোযা-হজ-যাকাত পালন। তাদের চিন্তার গণ্ডিতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভাবনা যেমন নেই, তেমনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জিহাদ নেই, কোরবানীও নেই। আল্লাহর শরিয়তী বিধান রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হলো কি হলো না তা নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যাথা নেই, আগ্রহও নেই। তাদের ধর্ম-পালন স্রেফ নামায-রোযা-হজ-যাকাত পালনে সীমিত। বহু শত বছর ধরে মুসলিম দেশগুলিতে এরাই ধর্মপ্রাণ মুসলমান বলে প্রশংসিত হয়ে আসছে। তাদের ইসলামকে বলা হয় মডারেট ইসলাম। অপরদিকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় যারা বিশ্বাসী তাদেরকে চিত্রিত করা হয় মৌলবাদী বা চরমপন্থি মুসলমান রূপে। তাদের ইসলামকে বলা হচ্ছে পলিটিকাল ইসলাম। বাংলাদেশের সেক্যুলারিষ্টরা তাদেরকে জঙ্গিবাদী রূপে অভিহিত করছে এবং তাদের ইসলামকে বলছে জঙ্গি ইসলাম। স্বৈরাচার অধিকৃত প্রতিটি মুসলিম দেশে তাদেরকে রাজনৈতিক শত্রু রূপে দেখা হয়। তাদের উপর যে শুধু রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আছে বা জেল-জুলুম হচ্ছে তা নয়, তাদের হত্যায় কোন রূপ বিচার অনুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে বলেও মনে করা হয় না।

ইসলামের আংশিক অনুসরণকারি আজ ঘরে ঘরে। প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ মানুষ হজে যায়। বাংলাদেশে তাবলিগের জামায়াতের ইজতেমাতেও তিরিশ লাখের বেশী হাজির হয়। দেশে দেশে এরূপ বহু এজতেমা হচ্ছে, নির্মিত হচ্ছে হাজার হাজার মসজিদ ও মাদ্রাসা। লিখিত হচ্ছে লক্ষ লক্ষ বই। কিন্তু ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে লোক নেই। বরং বিরোধীতা শুরু হয়েছে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা নিয়ে। বলা হচ্ছে, ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ ও কোরবানী পেশের বিষয়টি ঈমানদার হওয়ার জন্য শর্ত নয়। অনেকে বলছেন, আল্লাহতায়ালা দেখেন মুমিনের ঈমান, এবং তার আক্বিদা, নামায-রোযা-হজ-যাকাতের ন্যায় ইবাদত। এ মতের প্রচারে শুধু যে সেক্যুলার রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীগণ ময়দানে নেমেছে তা নয়, ময়দানে নেমেছে বহু হাজার আলেম, অসংখ্য বুদ্ধিজীবী, এমন কি তথাকথিত ইসলামি আন্দোলনের বহু নেতা-কর্মীও। সবচেয়ে বড় বিভ্রাট ঘটছে ধর্মপালনের এ ক্ষেত্রটিতে। শ্রী চৈতন্য ভাববাদী গান গেয়ে বাংলায় ইসলামের দ্রুত প্রসার রুখে দিয়েছিলেন। মানুষ তখন গানের মধ্যে শুধু আনন্দ নয়, ধর্মও খুঁজতো। যীশু খৃষ্টের প্রতি ভালবাসার গানই খৃষ্টান ধর্মের মূল কথা। দল বেঁধে সে গান গাওয়াতের তাদের মনের প্রশান্তি। সেখানে হারাম-হালালের বালাই নেই। পাপ যত বিশাল ও জঘন্যই হোক তাতে শাস্তির ভয় নেই, সে পাপের প্রায়শ্চিত্য ঈসা (আঃ) বহু আগেই করে গেছেন। খৃষ্টানদের কাজ হলো শুধু গীর্জায় গিয়ে তার ভক্তিতে গান গাওয়া। চিকিৎসার নামে ঝাড়-ফুঁকের মধ্যেও যেমন অজ্ঞ মানুষের কিছুটা তৃপ্তিবোধ থাকে, তেমনি তৃপ্তিবোধ রয়েছে এমন ধর্মপালনেও। সেটি যে কতটা সত্য-নির্ভর তা নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনাও নেই। ধর্ম পালনের সে পথ শেখানোর সে কৌশলটি গ্রহণ করছে বাংলাদেশের সেক্যুলারগণও। তাই তারা লালন শাহ ও হাসন রাজার ভাববাদী গানের খোঁজ করছে। ইসলামী রাষ্ট্র নির্মানের আন্দোলন যতই তীব্রতা পাচ্ছে, সেক্যুলারিস্টদের পক্ষ থেকে ততই বাড়ছে এসব গানের গুরুত্ব। নিছক মুসলিম সেক্যুলারিস্টই নয়, এদের পিছনে অমুসলিমদেরও বিপুল অর্থ, শ্রম ও মেধা ব্যয় হচ্ছে। ব্রিটেনে, ফ্রান্স ও মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলির শত শত কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগের সাথে বিশাল বিনিয়োগ করছে ভারতও। কারণ, ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা প্রতিহত করার মধ্যেই তাদের সামরিক, অর্থনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ। তারা জানে, সভ্যতা কখনোই খানকায় গড়ে উঠে না। কোন মসজিদ- মাদ্রাসায়ও বিশ্বশক্তি নির্মিত হয় নয়। এজন্য চাই ইসলামী রাষ্ট্রের নির্মান। এজন্যই তাদের টার্গেটে মসজিদ-মাদ্রাসা বা খানকা নয়। বরং সেগুলির নির্মানে তারা অর্থ দিচ্ছে, নিজ দেশে তারা বহু মূল্যবান জমিও দিচ্ছে। তারা বদ্ধপরিকর ইসলামী রাষ্ট্রের নির্মান প্রতিহত করায়। সে লক্ষ্যে তারা লাগাতর প্রচারনা, সামরিক হামলা ও ড্রোন হামলার স্ট্রাটেজী গ্রহণ করেছে। শয়তান জানে, ইসলামী রাষ্ট্রই এ জমিনে মহান আল্লাহর ফেরিশতা নামিয়ে, তখন বিশ্বশক্তিতে পরিনত হয় মুসলিম রাষ্ট্র। সভ্যতার দ্বন্দে এমন রাষ্ট্রই তাদের প্রকৃত প্রতিপক্ষ। অথচ তেমন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা প্রতিহত করা গেলে তখন সামনে কোন প্রতিদ্বন্দীই থাকে না। সেক্যুলার মুসলিম রাষ্ট্রগুলি নামে মুসলমান হলেও কার্যতঃ তাদের মিত্র। ইসলামী রাষ্ট্র নির্মান রুখার সে স্ট্রাটেজীকে সামনে নিয়েই ইসলামের মৌলবাদ নির্মূলের নামে গড়ে উঠছে বিশাল আন্তর্জাতিক কোয়ালিশন।

মুসলমানের মাঝে তার নিজের স্বার্থ ও নিজের খেয়াখুশি গুরুত্ব পাওয়া অস্বাভাবিক নয়। পরিবারের স্বার্থ, দলের স্বার্থ ও আঞ্চলিক স্বার্থের ন্যায় নানা স্বার্থ তার মধ্যে কাজ করে। ফলে সে আপোষ করে; বিভ্রাটে পড়ে এবং বিভ্রান্তও হয়। কিন্তু ইসলামের সম্পর্ক মহান আল্লাহ ও তার নাযিলকৃত কোরআনের সাথে। ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থ তাই নিছক মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্র নয়। রাষ্ট্রকে ইসলামী হতে হলে তাকে পরিচালিত হতে হয় আল্লাহর নির্দেশনায়। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার সাথে তখন গুরুত্ব পায় তাঁর এজেণ্ডার সাথে পরিপূর্ণ একাত্মতাও। সেখানে প্রতিষ্ঠা পায় ইসলামের শরিয়তী বিধান। কোন গৃহে খাবারে শুকরের গোশত ও মদ শোভা পেলে সে পরিবারের সদস্যদের কি ঈমান বাঁচে? থাকে কি মুসলমানিত্ব? মুসলিম পরিবারের সদস্যদের দায়িত্ব শুধু নামায-রোযা পালন নয়, বরং হারাম-হালালের বাছবিচারও। সেটি খাদ্য-পানীয়সহ সর্ব ক্ষেত্রে। এক ক্ষেত্রে দায়িত্বশূণ্য হলে সেটি ঈমানশূন্যতার জন্ম দেয়। একই কারণে মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব হলো, রাষ্ট্রকেও কোরআনী বিধানের আওতায় আনা। ইসলামী রাষ্ট্র নির্মানের দায়ভার তখন প্রতিটি ঈমানদার নাগরিকের কাঁধে এসে যায়। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, "উদখুলু ফিসসিলমি কা'ফফা", অর্থঃ ইসলামে প্রবেশ করো পরিপূর্ণ রূপে। অর্থাৎ যেখানেই আল্লাহর হুকুম, সেখানেই সে হুকুম প্রতিপালনে অবনত হও। আল্লাহর বিধানকে তাই নিছক নামায-রোযা-হজ-যাকাতে সীমাবদ্ধ রাখার সুযোগ নাই। আত্মীক পরিশুদ্ধি শূন্যে ঘটে না, সে লক্ষ্য পূরণে পরিশুদ্ধি আনতে হয় সমাজ ও রাষ্ট্রে। রাষ্ট্রে তখন নৈতিক স্বাস্থ্যসম্পন্নতা আসে। তবে সে জন্য রাষ্ট্রকেও কোরআনী বিধানের আওতায় আনতে হয়। কিন্তু সে উদ্দেশ্যটি ব্যাহত হয় যদি আদালতে কুফরি আইন প্রতিষ্ঠা পায় এবং সংবিধানে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও তাঁর উপর আস্থা বিলুপ্ত হয়। অথচ বাংলাদেশে সেটিই হয়েছে। দেশটির সংবিধান থেকে আল্লাহর উপর আস্থা ও তাঁর সার্বভৌমত্ব যেমন বিলুপ্ত হয়েছে, তেমনি আদালতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে ব্রিটিশ-প্রণীত পেনাল কোড। ফলে দেশটিতে সূদ, মদ, জুয়া, পতিতাবৃত্তির ন্যায় নানাবিধ পাপাচার ও অপরাধও নিষিদ্ধ নয়।

□□□□□□ □□ □□□□□□□□□

আজকের মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা এ নয় যে, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-কৃষি ও সামরিক ক্ষেত্রে তারা পিছিয়ে আছে। বরং সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা, ৫৫টিরও বেশী মুসলিম রাষ্ট্রের মাঝে একটিও ইসলামী রাষ্ট্র নয়। মহান আল্লাহর দরবারে এ ব্যর্থতার কৈফিয়ত অবশ্যই দিতে হবে। একটি দেশে সমাজতন্ত্রীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলে সে দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পায়। তেমনি পুঁজিবাদ বা সেক্যুলারিজমের প্রতিষ্ঠা বাড়ে যদি সে মতবাদের অনুসারিরা দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়। তাই দেশে কতগুলি মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মিত হলো বা কতজন আলেম তৈরী হলো -মহান আল্লাহতায়ালার কাছে স্রেফ সেটিই গুরুত্বপূর্ণ নয়। অধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো, ইসলামী রাষ্ট্রের নির্মাণে কতটা অগ্রগতি সাধিত হলো। কারণ মহান আল্লাহ চান তার দ্বীনের বিজয় এবং শরিয়তের প্রতিষ্ঠা। শরিয়তের প্রতিষ্ঠা এবং বাতিলী শক্তির উপর আল্লাহর দ্বীনের বিজয় মসজিদে বা জায়নামাযে ঘটে না, মসজিদ এবং জায়নামায সে জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্রও নয়। সেটি ঘটে রাষ্ট্রে। তবে লক্ষণীয় হলো, মাত্র কয়েক লক্ষ সাহাবী যে কাজটি করতে পেরেছিলেন, আজকের দেড়শত কোটি মুসলমান সেটি পারছে না। আর মুসলমানদের এ ব্যর্থতা বড় ব্যর্থতার জন্ম দেয়, সেটি আল্লাহর সাহায্য লাভে। সে ব্যর্থতা তখন নামিয়ে আনে আল্লাহর আযাব। সিনা মরুভূমিতে বনি ইসরাইলীদের বাঁচাতে করুণাময় আল্লাহতায়ালা আসমান থেকে মান্না-সালওয়া পাঠিয়েছিলেন। সে খাদ্য লাভে তাদেরকে কোনরূপ মেহনতই করতে হয়নি। এভাবে যখন মহান আল্লাহর নেয়ামত আসে তখন বাড়তি কিছু দায়ভার ও পরীক্ষাও আসে। কিন্তু বনি ইসরাইলরা সে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছিল।

আল্লাহর দ্বীনের মূল কথা হলো তাঁর আনুগত্য। সেটি তাঁর প্রতিটি হুকুমের প্রতি। কিন্তু বনি ইসরাইলের লোকেরা ইতিহাস গড়েছিল আল্লাহর অবাধ্যতায়, মহান আল্লাহতায়ালা সে অবাধ্যতার কাহিনী পবিত্র কোরআনে বার বার তুলে ধরেছেন। একটি জাতির জীবনে এমন অবাধ্যতা কিভাবে পরাজয় ও বিপর্যয় ডেকে আনে বার বার সে উদাহরণও তিনি দিয়েছেন। লক্ষ্য, কোরআনের অনুসারিদের হুশিয়ার করা। কিন্তু এতসব শিক্ষণীয় ইতিহাসের পরও একই রূপ অবাধ্যতা ভর করছে আজকের মুসলমানদের উপর। অথচ মুসলমানদের জন্যও আজ মান্না-সালওয়া আসছে অতি বিপুল ভাবে। সেটি আসমান থেকে নয়, বরং মাটির বুক চিরে। শত শত ট্রিলিয়ন ডলারের তেল-গ্যাস ও নানারূপ খনিজ সম্পদ রূপে। সেটি লাভের জন্যও আজকের মুসলমানদের কোন মেহনত করতে হচ্ছে না। তেল-গ্যাসের বাইরেও মুসলমানদের হাতে রয়েছে মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ দান, সেটি আল-কোরআন। প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের বিজয়ের পিছনে মূল শক্তি ছিল এই আল-কোরআন।
আল-কোরআনের অনুসরণের মাধ্যমেই তারা সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতার জন্ম দিয়েছিলেন। কিন্তু আজকের ব্যর্থতা শুধু আল-কোরআনের অনুসরণে নয়, দারুন ভাবে ব্যর্থ হচ্ছে প্রদত্ত সম্পদের ব্যবহারেও। বিশ্বের আর কোন জাতির হাতে এতবড় নেয়ামত যেমন নেই, এত বড় খেয়ানতও নাই। আর খেয়ানত তো সব সময় পরাজয় ও বিপর্যয় ডেকে আনে। বিশ্বের মুসলমান তো সে বিপর্যয়েরই মুখে।

[illegible]

আল-কোরআনের যেখানেই পূর্ণ অনুসরণ, সেখানেই প্রতিষ্ঠা পায় ইসলামী রাষ্ট্র। আর্কিটেক্ট-প্রণীত ডিজাইন অনুসৃত হলে সে ডিজাইন মাফিক ইমারত নির্মিত হবে সেটিই তো স্বাভাবিক। সেটি ইসলামী রাষ্ট্রের বেলায়ও। মহান আল্লাহ হলেন ইসলামি রাষ্ট্রের স্থপতি। সে রাষ্ট্রের নির্মানে প্রতিটি মুসলমান হলো কারিগর। নবীজী (সাঃ) এবং তাঁর

সাহাবায়ে কেরাম সে ডিজাইনের অনুসরণে নিজেদের শ্রম, মেধা, অর্থ ও রক্ত ব্যয় করেছিলেন বলেই নির্মিত হয়েছিল ইসলামী সভ্যতার ইমারত। আর আজ মুসলমানগণ নিজেদের শ্রম, মেধা, অর্থ ও রক্ত ব্যয় করছে সেক্যুলার, জাতীয়তাবাদী, পুঁজিবাদী বা সমাজবাদী ডিজাইনে রাষ্ট্র নির্মানে। আল্লাহর সাথে এর চেয়ে বড় বিশ্বাসহীনতা বা গাদ্দারী আর কি হতে পারে? বনী ইসরাইলের লোকেরা বসে বসে মান্না-সালওয়া খেয়েছে, এবং যখনই হযরত মূসা (আঃ) মাত্র ৪০ দিনের জন্য আল্লাহর সান্নিধ্যে গিয়েছিলেন তখনই গাভীর মুর্তি নির্মান করে তারা পুজা শুরু করেছে। এক মুর্তিপুজককে ধর্মীয় জীবনের স্থপতি রূপে গ্রহণ করেছে। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যখনই তাদেরকে কানান দেশে গিয়ে বসতি স্থাপন এবং সেখানে ইসলামি রাষ্ট্র নির্মানের হুকুম এসেছে তখন তারা সে হুকুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। বলেছে, “হে মুসা (আঃ) তুমি এবং তোমার আল্লাহ গিয়ে যুদ্ধ কর। আমরা অপেক্ষায় থাকলাম।” আল্লাহর অবাধ্যতা আর কাকে বলে? একই রূপ অবাধ্যতা ভর করেছে আজকের মুসলমানদের ঘাড়ে। রাষ্ট্র নির্মানে মহান আল্লাহর দেয়া নকশাকে অনুসরণ না করে অনুসরণ করছে তাদের যারা ইসলামের চিহ্নিত দুষমন। তাদের আরধ্য স্থপতিদের কেউ বা নাস্তিক, কেউ বা সেক্যুলারিস্ট, কেউ বা পৌত্তলিক, আবার কেউ বা জাতিয়তাবাদী। মুসলিম দেশগুলি আজ এদের হাতেই অধিকৃত।

□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□

প্রশ্ন হলো, ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ছাড়া কোরআনের কি পূর্ণ অনুসরণ সম্ভব? সরকারের অনুমতি ছাড়া একখানি স্কুল, মাদ্রাসা, কারখানা বা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাও সম্ভব নয়। কোরআন হাদীসের আলোকে একখানি ফতোয়া দেয়াও সম্ভব নয়। ফলে কীরূপে সম্ভব আল-কোরআনে নির্দেশ-মাফিক অন্যায়ের প্রতিরোধ ও ন্যায়ের প্রতিষ্টা? কীরূপে সম্ভব শরিয়তের প্রতিষ্ঠা? এরূপ দেশে শরিয়তী বিধান তো কেতাবে বন্দী হয়ে পড়ে। যেমনটি হয়েছে বাংলাদেশসহ অধিকাংশ মুসলিম দেশে। অথচ মহান আল্লাহর কাছে অতি প্রিয় হলো ইসলামী রাষ্ট্রের নির্মান। এমন রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষায় মহান আল্লাহতায়ালা তাঁর সম্মানিত ফেরেশতাদের পাঠান। কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুসলিম মোজাহিদ আর ফেরেশতারা তখন একাকার হয়ে যায়। তখন অনিবার্য হয় বিজয়লাভ। সেটি যে শুধু বদর যুদ্ধে ঘটেছিল তা নয়, তেমন সাহায্যলাভ ঘটেছিল ওহুদ, খন্দক, হুনায়ুন, তাবুক, মুতাসহ অসংখ্য যুদ্ধে। সে বিবরণ পবিত্র কোরআনে বার বার এসেছে। অথচ মসজিদে জায়নামাযে বা পীরের খানকায় নিছক জিকিরে বসে বা স্রেফে নামায-রোযার মাধ্যমে মুসলমানেরা আল্লাহর আরশ থেকে হাজার ফেরেশতার বাহিনী নামিয়ে এনেছে এবং বিজয় এনেছে সে প্রমাণ নেই। সাহায্য পাওয়ার শর্তটি হলো, ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং সে রাষ্ঠ্রের প্রতিরক্ষায় নিজেদের জানমালের বিনিয়োগ। নবীজী (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম সে পথেই মহান আল্লাহর সাহায্য পেয়েছিলেন। তেমন একটি ইসলামী রাষ্ট্র রাসূলুল্লাহ (সাঃ)র মক্কী জীবনে নির্মিত হয়নি, ফলে সেখানে বদর, ওহুদ, খন্দক, হুনায়ুনের ন্যায় জানমালের বিনিয়োগে ক্ষেত্রেও প্রস্তুত হয়নি। জান-মালের সে বিনিয়োগটি নামায-রোযা ও হজ-যাকাতে ঘটে না। সে জন্য হিযরত করতে হয়, হিযরত শেষে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাও করতে হয়। শুধু ইসলামের ইতিহাসে নয়, সমগ্র মানব জাতির ইতিহাসে মক্কার মুসলমানদের মদিনায় হিজরত এজন্যই এতটা ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ। তাদের হিজরতের ফলে শুধু যে একটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল তা নয়, উদ্ভব ঘটেছিল মানব-ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতার এবং সে সাথে বিশ্বশক্তির। মানব জাতির ইতিহাস সে দিনটিতে নতুন মোড় নিয়েছিল। হিজরতের দিনটি থেকে সাল গণনা চালু করে সেকালের মুসলমানরা হিজরতের সে গুরুত্বটাই মূলত বুঝিয়েছেন।

□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□

তাছাড়া ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না হলে সে রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার প্রশ্ন উঠে না। প্রশ্ন উঠে না শরিয়ত প্রতিষ্ঠার এবং সে সাথে জিহাদের। অনৈসলামিক রাষ্ট্রে তখন গুরুত্ব হারায় ঈমানদারদের জানমালের বিনিয়োগের বিষয়টি। ফলে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ না নিলে মুসলমানের জানমাল ও মেধার বিপুল অপচয় ঘটে। তখন কোটি কোটি মানুষ জানমালের কোন রূপ বিনিয়োগ না রেখেই ইতিহাস থেকে হারিয়ে যায়। অথচ ইসলামী রাষ্ট্রের নির্মানে বিস্ফোরণ ঘটে সে শক্তির। নবীজীর আমলে দাওয়া, জিহাদ ও রাজনীতির ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ময়দানে নেমে এসেছিলেন প্রতিটি মুসলমান। কিছু অন্ধ, পঙ্গু ও বৃদ্ধ ছাড়া প্রত্যেকে ছুটেছেন জিহাদের ময়দানে। তখন বেতনভোগী সেনা-অফিসার বা সেপাই পালনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। প্রতিটি নাগরিক পরিণত রাষ্ট্রের অতন্দ্র প্রহরীতে। তারা পরিণত হয়েছিলেন রাষ্ট্রের পাওয়ার হাউসে। অথচ বাংলাদেশের ন্যায় মুসলিম দেশে শতকরা একজন লোকও কি তেমন বিনিয়োগে ময়দানে নেমেছে। বাংলাদেশের মত গরীব দেশে উচ্চ বেতন বা দামী প্লটের প্রতিশ্রুতি দিতে হয় সেনা অফিসারদের। নবীজী দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে পাথরের আঘাতে আহত হয়েছেন। আর আজকের আলেমগণ অর্থ না দিলে ওয়াজ করতেও রাজী নন। সেক্যুলারিজম তথা পার্থিব স্বার্থ চেতনা মুসলমানদের চেতনা যে কতটা কলুষিত করেছে এ হলো তার নমুনা। ফলে ইসলাম শক্তি পাবে কোত্থেকে? মহান আল্লাহই বা কেন এমন জাতির পিছনে কেন নিজের ফেরেশতাদের পাঠাবেন? আল্লাহতায়ালা তো তাদের সাহায্যে ফেরেশতা পাঠান যাদের নিজেদের বিনিয়োগটি জানমালের।

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় মুসলমানেরা যে দ্রুত বিশ্বশক্তিতে পরিণত হয় তা নিয়ে সেক্যুলার মুসলমানদের সংশয় থাকলেও সে সংশয় শয়তানের নাই। ফলে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা নবীজী (সাঃ)র আমলে যেমন মেনে নিতে রাজী ছিল না, তেমনি আজও রাজী নয়। ২০০১ সালে আফগানিস্তানের উপর মার্কিন হামলার মূল হেতু তো সেটিই। উপমহাদেশের মুসলমানদের পাকিস্তান প্রজেক্ট এজন্যই শুরু থেকেই হামলার মুখে পড়ে। ইরানের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির লাগাতর ষড়যন্ত্রের হেতুও এখানে। বাংলাদেশে ইসলামের বিপক্ষ শক্তির সরকার এজন্যই ইসলামপন্থিদের বিরুদ্ধে নির্যাতনে নেমেছে এবং খুঁজে খুঁজে জিহাদ বিষয়ক বই বাজেয়াপ্ত করে। মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার সাথে সাথে সে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করতে এজন্যই হামলা শুরু হয়েছিল। তখন সে হামলার হাত থেকে ইসলামী রাষ্ট্রকে বাঁচাতে শুধু ঈমানদারদের বিনিয়োগই বাড়েনি, তার চেয়েও বেশী বেড়েছিল আল্লাহর বিনিয়োগও। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহর সে নিজস্ব বিনিয়োগের বিবরণটি এসেছে এভাবেঃ “স্মরণ কর, (বদরের যুদ্ধের প্রাক্কালে) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে সাহায্য প্রার্থণা করেছিলে; তখন তিনি তোমাদেরকে জবাব দিয়েছিলেন, “আমি তোমাদিগকে সাহায্য করবো এক হাজার ফিরিশতা দিয়ে, যারা একের পর আসবে।” –(সুরা আনফাল আয়াত ৯)। বদরের যুদ্ধে কাফের যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল এক হাজার। আর মুসলিম মোজাহিদদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন। এবং তারাও কোন চুড়ান্ত যুদ্ধের জন্য পরিকল্পনা মাফিক সেখানে হাজির হননি। তাদের লক্ষ্য ছিল, আবু সুফিয়ানের সিরিয়া থেকে ফেরতগামী বাণিজ্য কাফেলার উপর স্ট্রাটজিক হামলা এবং তাকে সবক শেখানো। কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনা মাফিক ঘনিয়ে আসলো এক ভয়ানক যুদ্ধ। তবে সংখ্যায় অল্প হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানেরা সেদিন পিছুটান দেয়নি। ইহুদীদের ন্যায় নবীজী (সাঃ)কে তাঁরা একথা বলেনি যে “যাও তুমি আর তোমার আল্লাহ গিয়ে যুদ্ধ কর। আমরা অপেক্ষায় থাকলাম।” বরং বলেছেন, “হে আল্লাহর রাসূল, আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি। আপনি যদি আমাদেরকে নিয়ে সমূদ্রেও ঝাঁপিয়ে পড়েন তবুও আমাদেরকে সাথে পাবেন।” মহান আল্লাহ তো তাঁর বান্দাহর এমন বিনিয়োগটিই দেখতে চান। তাদের নিজ প্রাণের এমন বিনিয়োগই আল্লাহর সাহায্যলাভকে সুনিশ্চিত করে। অতীতে মুসলমানদের বিজয় তো এভাবেই এসেছে। এমন বিজয় যেমন জনশক্তিতে আসেনি, তেমনি অর্থবলেও আসেনি। এসেছে আল্লাহর সাহায্যে। আর কার সাহায্য মহা-পরাক্রমশালী আল্লাহর সাহায্যের চেয়ে শক্তিশালী হতে পারে? পবিত্র কোরআনে তাই বলেছেন, “এবং কোন সাহায্যই নাই একমাত্র আল্লাহর নিকট থেকে আসা সাহায্য ছাড়া। আল্লাহই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” –(সুরা আনফাল আয়াত ১০)। শত্রু শক্তির বিরুদ্ধে লড়ায়ে মুসলমানদের প্রস্তুতিতে

কোন রূপ কমতি থাকলে সেটি পূরণ করে দেন প্রজ্ঞাময় মহান আল্লাহ। এটিই আল্লাহর সুন্নত। বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের যা সৈন্যসংখ্যা ছিল আল্লাহতায়ালা তার তিনগুণের অধিক ফেরেশতাদের দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। আর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ যখন সাহায্য করেন তখন কি সে বাহিনীকে দুনিয়ার কেউ হারাতে পারে? নিঃস্ব ও স্বল্প সংখ্যক মুসলমানের পক্ষে সে কালে বিশ্বশক্তি রূপে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার মূল রহস্য তো এখানেই। আজও কি এর বিকল্প পথ আছে?

কোন ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠিও যখন নিছক মহান আল্লাহর এজেণ্ডা নিয়ে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে তখন সে রাষ্ট্র আল্লাহর রাষ্ট্রে পরিনত হয়। আল্লাহর সাহায্য লাভের জন্য সে রাষ্ট্রটি তখন শ্রেষ্ঠ অসিলায় পরিনত হয়। ইসলামী রাষ্ট্র নির্মিত না হলে তাই মুসলমানেরা বঞ্চিত হয় মহান আল্লাহর সাহায্য লাভের সে সুনিশ্চিত অসিলা থেকে। মুসলমানদের জীবনে সবচেয়ে বড় ক্ষতিটা ঘটে তখন। মান্না-সালওয়া জুটলেও তখন বিজয় আসেনা, ইজ্জতও বাড়ে না। নির্মিত হয় না ইসলামী সভ্যতা ও বিশ্বশক্তি। আজকের মুসলমানেরা অঢেল সম্পদের উপর বসবাস করেও পরাজিত ও অপমানিত হচ্ছে তো সে কারণেই। অথচ ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষায় মহান আল্লাহর ফেরেশতারা সদাপ্রস্তুত। সে প্রতিশ্রুতি মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বার বার শুনিয়েছেন। তবে তাদের জমিনে নামার শর্ত হলো, মোমেনের জানমালের বিনিয়োগটি বিপুল ভাবে থাকতে হবে। মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতি নিয়ে সাহাবাদের মনে সামান্যতম সন্দেহ ছিল না। তাই কার্পণ্য ছিল না তাদের জানমালের বিনিয়োগেও। ইসলামের বিজয়ের এটিই তো একমাত্র রোডম্যাপ। কিন্তু মুসলমানদের চেতনায় বড় বিভ্রাট গড়ে উঠেছে এ ক্ষেত্রেটিতে। তাদের ভরসা বেড়েছে নিছক অর্থ, অস্ত্র ও লোকবলের উপর, আল্লাহর সাহায্যের উপর নয়। ফলে অর্থ, অস্ত্র ও জনশক্তি বিপুল ভাবে বাড়লেও পরাজয় এড়ানো সম্ভব হচ্ছে না।

□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□ □□□□□

নবীজী (সাঃ)র আগে ইসলামের নানা রূপ ও নানা ফেরকা ছিল না। শিয়া ও সুন্নী ইসলাম, সূফী ইসলাম এবং ওহাবী ইসলামের অস্তিত্ব যেমন ছিল না, তেমনি মডারেট ইসলাম, জঙ্গি ইসলাম বা চরমপন্থি ইসলাম বলেও কিছু ছিল না। সেদিন ছিল ইসলামের একটিমাত্র রূপ। ইসলামের সে সনাতন রূপটি আজও সুস্পষ্ট ভাবে বেঁচে আছে কোরআন হাদীসের মাঝে। আজকের মুসলমানদের বড় সমস্যা হলো, কোরআন- হাদীসের সে শিক্ষা থেকে দূরে সরেছে। ফলে তাদের কাছে সবচেয়ে অপরিচিত ও অজানা রয়েছে নবীজী (সাঃ)র ইসলাম। ফলে তারা বিস্মিত হয় ইসলামের রাষ্ট্র নির্মানের কথা শুনে। আরো বিস্মিত হয় জিহাদের কথা শুনে। কারণ, তারা যে ইসলামের সাথে পরিচিত সে ইসলামে মসজিদ-মাদ্রাসা, খানকা, দরগাহ, তাবলিগ, ছিল্লাহ, গাশত, তাসবিহ-তাহলিল, পীর-মুরিদী ও ক্যাডারের কথা আছে। নির্বাচনের কথাও আছে। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র নির্মানের কথা নেই। জিহাদও নাই। ইসলামের নামে প্রাণদানের কথাও নাই। তারা কোরআন হাদীস পড়লেও তা পড়ে তাদের নিজ নিজ ফেরকা, নিজ দল ও নিজ মজহাবের ইসলামকে অন্য মজহাব,অন্য দল, অন্য পীর ও অন্য ফেরকার মোকাবেলায় সঠিক রূপে প্রমাণ করার লক্ষে। ইসলামকে রাষ্ট্রের বুকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে যেমন নয়, তেমনি নবী (সাঃ)র আমলের ইসলামকে জানার জন্যও নয়। আর সেটি হলে নবীর আমলের ইসলাম তাদের কাছে এত অপরিচিত থাকে কি করে? মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামের

শরিয়তী বিধানই বা এত অপরাজিতই বা থাকে কি করে? যোগাযোগ, বাণিজ্য, শিল্প, চিকিৎসা বা শিক্ষার ন্যায় বিষয়গুলিও কি কোন রাষ্ট্রে সুষ্ঠ ভাবে চলে, যদি না তার উপর সরকারের যথার্থ নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি না থাকে? আর ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্ব নিয়ে ইসলামের বিধি-বিধান তো বিশাল। সেগুলো কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে বা কিভাবেই বা সেগুলো রাষ্ট্রে সুফল ফলাবে যদি সে রাষ্ট্রের উপর ইসলামের পক্ষের শক্তি নিয়ন্ত্রন হারায়? মানব সমাজে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হলো রাষ্ট্র। সেটি যদি ইসলামের শত্রু পক্ষের হাতে যায় তখন কি সে সমাজে ইসলামের প্রতিষ্ঠা ঘটে? বিজয়ী হয় কি মহান আল্লাহর এজেণ্ডা? তাই ইসলামি রাষ্ট্র নির্মান ছাড়া ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখা যায়? অথচ সে অলীক স্বপ্ন নিয়েও বহু মুসলমান বিভোর!এমন স্বপ্ন নিয়ে এককালে বহু সুফী দরবেশ খানকায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন, এবং রাজনীতিতে অনীহা ও নির্লিপ্ততা বাড়িয়েছিল সাধারণ মুসলমানদের। আর তাতে বিজয় ও দুর্বৃত্তি বেড়েছিল স্বৈরাচারি রাজা-বাদশাহদের। রাজনীতি থেকে দূরে সরাতেই ব্রিটিশ সরকার ভারতে আলীয়া মাদ্রাসা নির্মান করেছিল। আজও মুসলিম দেশগুলিতে একই ঘটনা ঘটছে। ধর্মীয় শিক্ষার নামে আজও একই ভাবে মুসলমানদের মাঝে রাজনীতিতে অনীহা বাড়ানো হচ্ছে। ফলে তার কুফলও ফলছে। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের অনীহার কারণে বাংলাদেশের মত একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশে যে শরিয়তের প্রতিষ্ঠা ব্যহত হচ্ছে তা নয়, দেশটিতে স্বৈরাচারের দুর্বৃত্তি যেমন বাড়ছে তেমনি বেড়ে চলছে সর্বক্ষেত্রে ইসলামের পরাজয়।

□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□

ইসলামের ইতিহাসে যে বিষয়টি অতীত থেকেই সবসময়ই চলে আসছে তা হলো, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও আত্মত্যাগের যেখানেই কঠিন পরীক্ষা সেখানেই বিতর্ক খাড়া হয় সেটি এড়ানোর। সেটি নবীজী (সাঃ)র আমলে যেমন হয়েছে তেমনি নবীজী (সাঃ)র পূর্বেও হয়েছে। এবং আজও হচ্ছে। বদরের যুদ্ধের প্রাক্কালে নবীজী(সাঃ)র সাথেও তা নিয়ে অনাকাঙ্খিত বিতর্ক করেছিলেন কিছু সাহাবী। সাহাবাদের মধ্যে তখন দুটি ভাগ দেখা দিয়েছিল। একদল চাচ্ছিলেন যুদ্ধকে পরিহার করতে। আরেক দল জিহাদে প্রস্তুত ছিলেন। মহান আল্লাহতায়ালা সে বিভেদটি দেখেছেন এবং সে চিত্রটিও তুলে ধরেছেন সুরা আনফালের প্রথম রুকুতে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, “এটি এরূপ, তোমার প্রতিপালক যেরূপ ন্যায়ভাবে তোমাকে তোমার গৃহ হতে বের করেছিলেন, মু’মিনদের একটি দল সেটি পছন্দ করেনি। সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাওয়ার পরও তারা তোমার সাথে বিতর্ক করে। মনে হচ্ছিল তারা যেন মৃত্যুর দিকে চালিত হচ্ছে, আর তারা যেন তা প্রত্যক্ষ করছে।। স্মরণ কর! আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিনে যে, দুই দলের একদল তোমাদের আয়ত্তাধীন হবে। (অথচ) তোমরা তোমরা চাচ্ছিলে নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তাধীন হোক। আর আল্লাহ চাচ্ছিলেন, তাঁর বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং কাফেরদের শিকড় নির্মূল করবেন। এজন্য যে, তিনি সত্যকে সত্য এবং অসত্যকে অসত্য প্রতিপন্ন করবেন, যদিও অপরাধীগণ এটি পছন্দ করে না। -(সুরা আনফাল, আয়াত ৫ -৮)।

তাই মহান আল্লাহ স্রেফ নামায-রোযা-হজ-যাকাত নিয়ে তিনি খুশি নন। ঈমানদারদের থেকে এগুলিই তাঁর একমাত্র চাওয়া-পাওয়া নয়। তাঁর লক্ষ্যটি ঘোষিত হয়েছে এভাবে, “সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং কাফেরদের শিকড় নির্মূল

করবেন” এবং “সত্যকে সত্য এবং অসত্যকে অসত্য প্রতিপন্ন করবেন”। মু’মিনদের ঈমানদারীর প্রকৃত দায়ভারটি হলো, মহান আল্লাহতায়ালার সে অভিপ্রায়ের সাথে পুরাপুরি সম্পৃক্ত হওয়া। “সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা”, কাফেরদের শিকড়কে নির্মূল করা” এবং “সত্যকে সত্য ও অসত্যকে অসত্য রূপে প্রতিপন্ন করা”র মিশনটি তাই শুধু আল্লাহর মিশন নয়, তাঁর অনুগত বান্দাহর মিশনেও পরিণত হয়। সাহাবাগণ সেটি বুঝতে ভূল করেননি। ফলে নিজেদের জানমাল দিয়ে সে কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। নামায-রোযা-হজ-যাকাতের ন্যায় সর্বপ্রকার ইবাদতের মূল লক্ষ্যটি হলো, সে আত্মনিয়োগে ঈমানদারদের সামর্থ বাড়ানো। যে ইবাদতে সে সামর্থ বাড়ে না, বুঝতে হবে সে ইবাদত মূল্যহীন ও মেকী। এমন মূল্যহীন মেকী ইবাদতে যারা অভ্যস্থ তারাই আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের নেতৃত্বে ওহুদের ময়দান থেকে সরে দাঁড়িয়েছিল। আর বদরের যুদ্ধে যাদের মধ্যে সামান্য গড়িমসি এসেছিল, তাদের সে দৃষ্টিভঙ্গিও যে মহান আল্লাহতায়ালার কাছে কতটা অপছন্দের ছিল সেটিও তিনি পবিত্র কোরআনে তুলে ধরেছেন।

[illegible]

কিন্তু আজকের সমস্যা শুধু মুর্খ-নিরক্ষর মুসলমানদের নিয়ে নয়। বরং সেটি ডিগ্রিধারী বুদ্ধিজীবী ও আলেমদের নিয়ে। এবং সেটি জ্ঞানের ময়দানে বিভ্রাটের কারণে। সে বিভ্রাটের কারণে তারা যেমন মহান আল্লাহর কোরআনী অভিপ্রায় বুঝতে ব্যর্থ হচ্ছেন, তেমনি ব্যর্থ হচ্ছেন সে অভিপ্রায়ের সাথে পুরাপুরি একাত্ম হতে। ফলে সেদিনের মুষ্টিমেয় সাহাবাগণ কাফের-অধ্যুষিত আরবের বুকে আল্লাহর দ্বীনের বিজয় আনতে সমর্থ হলেও আজকের লক্ষ লক্ষ আলেম ও ইবাদতকারি ব্যর্থ হচ্ছেন শতকরা নব্বই ভাগ মুসলমানের দেশে। এর কারণ, তারা ইসলাম শিখছেন ফেরকাপরস্ত, পীরপরস্ত ও দলপরস্ত আলেম ও পীরদের থেকে। ফলে তাদের জীবনে আল্লাহপরস্তির বদলে বেড়েছে পীরপরস্তি, ফেরকাপরস্তি ও দলপরস্তি। এখানে আখেরাতের ভাবনার চেয়ে কাজ করছে ইহকালীন ভাবনা। এটিই হলো আলেমদের সেক্যুলারিজম। এমন সেক্যুলারিজমের প্রভাবে ইহুদী আলেমেরা আল্লাহর বানী বিক্রয় করতো। আজও ধর্ম নিয়ে বানিজ্য বেড়েছে বহু মুসলিম আলেমের মাঝে। তাদের চাকুরি বাড়াতে বহু মাদ্রাসাও নির্মিত হচ্ছে। তারা ওয়াজ করেন অর্থলাভ দেখে। ফলে বাংলাদেশের মত মুসলিম দেশগুলিতে ইসলামের বিপক্ষ শক্তির পক্ষেও নিজ দলে ইসলামের লেবাসধারী আলেমের অভাব হচ্ছে না। আল্লাহর পবিত্র কোরআনকে তারা রেখে দিয়েছে তেলাওয়াতের জন্য, সেখান থেকে শিক্ষা নেয়ার জন্য নয়। নিজেদের ওস্তাদ বা শিক্ষকদের মত তাদেরও কাজ হয়েছে নিজ নিজ মজহাব, ফিরকা বা তরিকতকে বিজয়ী করা। ওস্তাদ বা পীরদের অভিপ্রায় কি সেটিই তাদের কাছে বড়, আল্লাহর অভিপ্রায় কি তা নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যাথা নেই। কোরআন-হাদীস শিক্ষার নামে মাদ্রাসা শিক্ষা যে কতটা ব্যর্থ হয়েছে তা নিয়ে করুণ ক্ষেদোক্তি করেছেন ভারতীয় উপমহাদের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন এবং দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান শায়খুল হাদীস জনাব মাওলানা মাহমুদুল হাসান। ভারতের তৎকালীন ঔপনিবেশিক বৃটিশ শাসকেরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁকে গ্রেফতার করে ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ মাল্টাতে রেখেছিল। মুক্তি পেয়ে তিনি দেওবন্দে আলেমদের এক সম্মেলন ডেকেছিলেন। সেখানে বলেছিলেন, “মুসলমানদের ব্যর্থতার কারণ নিয়ে কয়েক বছর ধরে আমি বহু চিন্তাভাবনা করছি। আমার কাছে মনে হয়েছে মুসলমানদের এ ব্যর্থতার কারণ দুইটি। এক. কোরআন শিক্ষায় গুরুত্ব না দেয়া। দুই. মুসলমানদের মাঝে অনৈক্য। আমরা বেশী জোর দিয়েছি হাদীস শিক্ষায়। এবং সেটিও অন্য মজহাবের তুলনায় হানাফী মজহাবকে শ্রেষ্ঠ প্রমানিত করতে। আমরা কোরআন বুঝায় তত জোর দেয়নি।”

মুসলমান হওয়ার অর্থই এক লাগাতর লড়াইয়ে আত্মনিয়োগ করা। ঈমানদার হওয়ার অর্থ শুধু এ নয়, মুখে কালেমা পাঠ এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনা। বরং ঈমানদারকে আরো বহু দূর যেতে হয়। মহান আল্লাহর সাথে তাঁকে চুক্তিবদ্ধ হতে হয়। চুক্তির সে ঘোষণাটি এসেছে এভাবে, "নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মোমেনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল, এই মূল্যে যে তাদের জন্য নির্ধারিত থাকবে জান্নাত। তাঁরা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাস্তায়, অতঃপর (আল্লাহর শত্রুদেরকে) হত্যা করে ও নিজেরাও নিহত হয়। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতিরক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেনে-দেনের উপর যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ মহান সাফল্য।" –(সুরা তাওবাহ, আয়াত ১১১)। অর্থাৎ এ চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার উপরই ঈমানদারের মহা-সাফল্য। আর সে সাফল্যই মোমেনের জীবনে মহা-আনন্দ আনে। কোরআন পাক এ জন্য নাযিল হয়নি যে মানুষ এটি শুধু সুললিত কন্ঠে বার বার পাঠ করবে এবং মুখস্থ করবে। বরং দায়িত্ব হল, কোরআন পাঠের সাথে তার শিক্ষাকে যেমন নিজে পালন করবে তেমনি সেটিকে সকল মত ও ধর্মের উপর বিজয়ী করতে অগ্রণী হবে। একাজে সে বিপক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে কঠোর এবং আপোষহীনও হবে। সেটি যে শুধু কোরআনের ঘোষণা তা নয়, অনুরূপ ঘোষণা দেয়া হয়েছিল পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবেও। পবিত্র কোরআনে সে ঘোষণাটি এসেছে এভাবে, "তিনিই তাঁর রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, অপর দ্বীনের উপর সেটিকে বিজয়ী করার জন্য। আর সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।" বলা হয়েছে, "মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল; তাঁর সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকু ও সিজদায় অবনত দেখবে। তাদের লক্ষণ, তাদের মুখমণ্ডলে সিজদার প্রভাব পরিস্ফুট থাকবে, তাওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপ এবং ইঞ্জিলেও তাদের বর্ণনা এরূপ।" -সুরা ফাতহ, আয়াত ২৮ -২৯)। এখানেও মোমেনের মিশন রূপে যেটি বর্ণিত হয়েছে সেটি দ্বীনের বিজয়। এবং সে বিজয়ের মাধ্যম হলো জিহাদ। জিহাদই যে পরকালে জাহান্নামের আগুণ থেকে মুক্তির পথ সে ঘোষনাটিও এসেছে। বলা হয়েছে "হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব যা তোমাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দিবে? আর তা হলো, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জেহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বোঝ। -(সুরা সাফ, আয়াত ১০-১১)। অর্থাৎ মু'মিনদের মুক্তির পথ নিছক কালেমা পাঠ, নামায-রোযা আদায় বা হজ-যাকাত পালনে রাখা হয়নি। সেটি রাখা হয়েছে জিহাদে। আর যেখানে জিহাদ থাকে, সেখানে সে জিহাদের বরকতে ইসলামী রাষ্ট্রও গড়ে উঠে। তখন সে রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা ঘটে শরিয়তের। তাই যে ভূমিতে ইসলামী রাষ্ট্র নাই, বুঝতে হবে সে সমাজে ইসলামের সঠিক উপলদ্ধি নাই। এবং নাই জিহাদ।

□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□?

মুসলমানের রাজনীতির এজেণ্ডা কোন জাতিয়তাবাদী, সমাজবাদী বা সেক্যুলার রাজনৈতীক দলের পক্ষে ভোটদান, অর্থদান বা রক্তদান নয়। বরং সেটি কীরূপ হবে সেটি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহতায়ালা। এবং তাতে সামান্যতম অস্পষ্টতাও রাখা হয়নি। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সে সুস্পষ্ট ঘোষণাটি এসেছে এভাবে, "তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মুসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে

অনৈক্য সৃষ্টি করো না। -(সুরা আশ-শুরা, আয়াত ১৩)। নানা যুগে ও নানা ভূখণ্ডে প্রেরীত নবী-রাসূলদের মাঝে বহুবিধ ভিন্নতা সত্ত্বেও যে অভিন্ন লক্ষ্যটি সর্বযুগে ছিল সেটি হলো এই দ্বীনের প্রতিষ্ঠা। শরিয়তে ভিন্নতা থাকলেও অভিন্ন ছিল তাদের দ্বীন। সে দ্বীনের মূল কথাটি হলো, আল্লাহর প্রতিটি হুকুমের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য। প্রতিটি বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা গণ্য হতো কুফরি রূপে। এমন কুফরির পথে শুধু যে ইবলিস ও কাফেরগণ অভিশপ্ত হচ্ছে তা নয়, অভিশপ্ত হচ্ছে মুসলমান নামধারি আল্লাহর অবাধ্য ও বিদ্রোহীরাও। কারণ নিছক নামে মুসলমান হলে কি সে অভিসম্পাত থেকে বাঁচা যায়?

প্রশ্ন হলো দ্বীন কি? শরিয়তই বা কি? দ্বীন হলো মহান আল্লাহর দেয়া সংবিধান, ইসলামে সে সংবিধানটি হলো পবিত্র কোরআন। আর শরিয়ত হলো সে সাংবিধানিক মূল নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আইন-কানুন। সংবিধানে আইনের খুঁটিনাটি থাকে না। থাকে মূলনীতি। আইন নির্মাণ করতে হয় সে মূলনীতির সাথে সঙ্গতি রেখে। ইসলামে আইনের বিশাল ফিকাহ শাস্ত্র গড়ে উঠেছে সে আইনী প্রয়োজন মিটাতে। কোরআনী সংবিধানের মূল কথা হলো আল্লাহর সার্বভৌমত্ব। নবী-রাসূলদের মূল মিশন ছিল, সে দ্বীন এবং দ্বীনের আলোকে শরিয়তের প্রতিষ্ঠা। আল্লাহর সে দ্বীন ও তাঁর শরিয়ত প্রতিষ্ঠার পথ ও প্রক্রিয়া নিয়ে সর্বশেষ উদাহরণ রেখেছেন শেষ নবী হযরত মহম্মদ (সাঃ)। তাঁর সে প্রক্রিয়ায় যেমন দাওয়াত ছিল, তেমনি জানমাল নিয়ে জিহাদ এবং সে জিহাদের মাধ্যমে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাও ছিল। নবীজী (সাঃ)র এটাই শ্রেষ্ঠ সুন্নত। ঈমানদার হওয়ার দায়বদ্ধতা হলো, সে সুন্নতের অনুসরণ। মুসলমানদের মাঝে সে সুন্নতের কতটা অনুসরণ হচ্ছে সেটি বুঝা যায় ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং সে রাষ্ট্রে শরিয়তের প্রয়োগ দেখে। এদিক দিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর অবস্থা শুধু ব্যর্থতায় পরিপূর্ণ নয়, বিদ্রোহাত্মকও। এবং সে বিদ্রোহ আল্লাহ ও তার দ্বীনের বিরুদ্ধে।

প্রতিটি সভ্য-সমাজেই অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সত্য-মিথ্যা এবং ন্যায়-অন্যায়ের মানদণ্ড। এবং সে অনুযায়ী সুষ্ঠ বিচার। নইলে সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা আসে না। সভ্যতর সমাজও গড়ে উঠে না। সেটি আরো গুরুত্বপূর্ণ হলো সে রাষ্ট্রে মুসলমান রূপে বাঁচার জন্য। তবে কী হবে সে সত্য-মিথ্যা ও ন্যায়-অন্যায়ের মানদণ্ড? প্রতি রাষ্ট্রে এটি এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সে তাড়না থেকেই জন্ম নিয়েছে নানা ধর্ম, নানা দর্শন ও নানা মতবাদ। ইসলামে সেটি নির্ধারণ করে দিয়েছেন স্বয়ং মহান আল্লাহতায়ালা। তাঁর দেয়া ন্যায় বিচারের সে মানদণ্ডটি হলো পবিত্র কোরআন। ফলে এখানে আবিস্কারের কোন সুযোগ নেই। আবিস্কার গণ্য হয় বিদয়াত রূপে। বরং ঈমানদার হওয়ার দায়বদ্ধতা হলো, সে মানদণ্ডের পূর্ণ অনুসরণ। মুসলমানকে তাই শুধু মুর্তিপুজা ও নাস্তিকতার গোনাহ থেকে বাঁচলে চলে না, তাকে আল্লাহপ্রদত্ত বিধানের অবাধ্যতা থেকেও বাঁচতে হয়। সচেষ্ট হতে হয় এবং প্রয়োজনে কোরবানী পেশ করতে হয় সে বিধানের প্রতিষ্ঠায়। তেমন এক ঈমানী দায়বদ্ধতা থেকেই জন্ম নেয় মুসলমানের রাজনীতি। তাই এ রাজনীতিতে সেক্যুলারিজম বা ইহজাগতিক মুনাফা লাভের ভাবনা থাকে না, বরং থাকে আল্লাহর কাছে পরকালে জবাবদেহীতার ভয়। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, “..যারা আল্লাহর নাযিলকৃত আইন অনুযায়ী বিচারের ফয়সালা করে না তারা কাফের। -(সুরা মায়েদাহ, আয়াত ৪৪)। পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছেঃ “…যারা আল্লাহর নাযিলকৃত আইন অনুযায়ী বিচারের ফয়সালা করে না তারা জালেম। -(সুরা মায়েদাহ, আয়াত ৪৫)। আবার বলা হয়েছে “…যারা আল্লাহর নাযিলকৃত আইন অনুযায়ী বিচারের ফয়সালা করে না তারা ফাসেক তথা পাপী। -(সুরা মায়েদাহ, আয়াত ৪৭)।

রাষ্ট্র সেক্যুলার বা নাস্তিকদের হাতে গেলে পাল্টে যায় ন্যায়-অন্যায় ও পাপ-পূণ্যের বিচার বোধ। সেক্যুলার সমাজে নারী-পুরুষের ব্যাভিচারও তখন প্রেমের রূপে নন্দিত হয়। শত্রুদের অস্ত্র কাঁধে নিয়ে মুসলমানদের দেশভাঙ্গাও রাজনীতিগণ্য হয়। উলঙ্গতা তখন সংস্কৃতি, পতিতাবৃত্তি তখন পেশা এবং সূদও তখন অর্থনীতি মনে হয়। বাংলাদেশসহ অনেক মুসলিম দেশে তো সেটিই ঘটছে। অথচ ইসলামের বিচারে এগুলি শুধু পাপই নয়, শাস্তিযোগ্য অপরাধও। তাই শুধু নামায-রোযা-হজ্জ-যাকাত পালন করলেই কাফের, জালেম ও ফাসেক হওয়া থেকে মুক্তি মেলে না। তাকে রাষ্ট্র ও সমাজের বুকে আল্লাহর আইনের প্রতিষ্ঠাতেও সচেষ্ট হতে হয়। রাষ্ট্রে আল্লাহর আইনের প্রতিষ্ঠার বিষয়টি ইসলামে এতই গুরুত্বপূর্ণ যে সেটি বুঝাতে মহান আল্লাহতায়ালা সুরা মায়েদায় পর পর তিনটি আয়াত নাযিল করেছেন। অথচ এভাবে একই সুরার পরপর তিনটি আয়াত নামায-রোযা বা হজ-যাকাতের গুরুত্ব বোঝাতেও নাযিল হয়নি। আল্লাহর আইনের প্রতিষ্ঠায় যারা অনাগ্রহী তাদের প্রকৃত পরিচয়টি যে কি, সেটিও উক্ত তিনটি আয়াতে সুস্পষ্ট ভাবে বলে দেয়া হয়েছে। তাই একটি মুসলিম রাষ্ট্রের চরিত্র কতটা ইসলামী সে বিচারটি দেশটির মুসলিম জনসংখ্যা বা মসজিদ-মাদ্রাসার সংখ্যা গুণে হয় না। সেটি হলে বাংলাদেশ বিখ্যাত ইসলামি রাষ্ট্র হতো। বরং সে বিচারটি হয় সেদেশে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও আল্লাহর আইনের প্রতিষ্ঠা আছে কিনা সেটি দেখে। তবে আখেরাতে কাঠগড়ায় খাড়া হবে দেশ নয়, বরং প্রতিটি নাগরিক। তখন বিচার হবে আল্লাহর নির্দেশিত পথে রাষ্ট্রকে গড়ে তোলার কাজে বা দেশবাসীকে অবাধ্য করায় কার কি অবদান ছিল সেটির। ফলে ইসলামী রাষ্ট্র বিপ্লবে অনাগ্রহী ও তা থেকে নির্লিপ্ত থাকার সুযোগ আছে কি?